দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বারোয়ারী

-যোগানদার

পত্রিকায় প্রকাশ, একটি জেলায় ব্যাপক আকারে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে যাচ্ছে। সমস্যাটিকে একটি জেলার সীমারেখার মধ্যে রেখে বিচার করলে ভুল হবে। এ সমস্যা আজ প্রায় প্রতিটি 'ফ্রি প্রাইমারী' স্কুলের এবং দেশের সর্বত্র বিরাজিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের এই চিত্র একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা এটা খুব ভালো করেই জানি, সরকার সারাদেশে যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, সেখানে লেখাপড়ার সূচনা হয় দীন-দরিদ্র সন্তানদের। অভিভাবকের আগ্রহেই তাঁদের হাত ধরে তারা এসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাসটিতে ভর্তি হয়। বর্ণ পরিচয়ের পর পর আর অন্যসব বিষয় নিয়ে পড়তে পড়তে বছর ঘুরে এলে হয় বার্ষিক পরীক্ষা। এই বার্ষিক পরীক্ষার বৈতরণী পেরিয়ে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দ্বিতীয় ক্লাসে উঠে। কিছুসংখ্যক অকৃতকার্য হয়। এইভাবে প্রতি ক্লাসে কৃতকার্য ছাত্রের সংখ্যা ভর্তি সংখ্যার তুলনায় কমতে কমতে খুব কম সংখ্যক ছাত্র ক্লাস ফাইভে এসে উঠে। এবার ফাইভ পাসের পর আসে হাই স্কুল। শুরু হয় নতুন পর্ব। ছাত্র বেতন, ফি, আনুষঙ্গিক খরচের মধ্যে পড়তে হয় বলে ক্লাস ফাইভেই অনেক ছাত্রকে বই ফেলতে হয়। গড়িয়ে গড়িয়ে ক্লাস টেন পর্যন্ত কায়ক্লেশে উঠে শুরু হয় এসএসসি পরীক্ষা পর্ব। বলাইবাহুল্য এই পরীক্ষাতেও গ্রাম-গঞ্জের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে হেরে গিয়ে অকৃতকার্যের খাতায় নাম লেখাতে হয়। এর পর এইচএইচসি। এই শ্রেণী উত্তরণের পর যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী তারাও পাস-ফেলের তরণী ঠেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীসমূহের সেশন জট আর নানা বাধা-বিঘ্নে মেঘে মেঘে অনেক বেলা গড়িয়ে যায়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের অবস্থাটা সাধারণের জন্য এই রকম। এখন প্রশ্ন হলো, কেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পা দিয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল ছেড়ে যাচ্ছে বা কেন তাদের স্কুল ছেড়ে যেতে হচ্ছে?

আগেই উল্লেখ করেছি, এদেশে দীন-দরিদ্রের সন্তানরা প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসে। এদের আর্থিক ভিত একেবারেই ন্যুব্জ। বই-পত্র, খাতা-কলম, লেখাপড়ার সুযোগ ও সময় দুর্বোধ্য বিষয় বুঝানোর অসুবিধায় অনেক অভিভাবকই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দু'এক ক্লাস পরই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেন। এদের মধ্যে মেধাবান ছেলেমেয়েরাও থাকে। অভিভাবকদের কাছে সংসারে শ্রমের মূল্য অপরিসীম। সম্ভবত সন্তান উৎপাদন আর্থিক ও অন্ন সাশ্রয়ের হাতিয়ার হিসেবে আজও অনেক অভিভাবকের কাছে যুক্তিনিষ্ঠ। "পড়িয়ে কি হবে, লাট হবে?" এধরনের মানসিকতাও আছে অভিভাবকের মধ্যে। বলা দরকার যে, দেশে শিক্ষিত বেকারদের হতাশাব্যঞ্জক চিত্রই পিতা-মাতাকে আরও লেখাপড়ার প্রতি বিমুখ করে। এছাড়াও এটা দিব্যি সত্য যে, একেবারে নিম্নমান থেকেই লেখাপড়া সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকের একটা ভৌতিক সম্পর্ক বিরাজ করে। শিক্ষক শিক্ষকই। সেই টোলের পণ্ডিতদের মত আজও তাদের কড়া মেজাজ। কোন বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে শুনতে হয়, 'বাড়ীতে তোমার মা-বাবা কি করে? তাদের কাছ থেকে বুঝে নিয়ো।' এ ধরনের উক্তি শোনার পর কোন বাচ্চা আর শিক্ষকের সংগে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে পারে না। তারপরও সিলেবাস শেষ করার এবং সিলেবাস অনুযায়ী স্থান লাভ করার বিষয়টি উহ্যই থেকে যাচ্ছে। সারাবছর স্কুলগুলোতে যেভাবে লেখাপড়া হয় তাতে সিলেবাস তো শেষ হয়ই না বরঞ্চ বোঝা হয়ে থাকে। ফলে, বোর্ডের পরীক্ষাতে দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীরা বই বা নকলের সুযোগ খোঁজে এবং অধিকাংশই ফেল করে।

স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা লক্ষ্য করছি বোর্ডের পরীক্ষাগুলোতে ফেলের হার পাসের হারের চাইতে অস্বাভাবিক পরিমাণ বেশী। এর কারণ নিশ্চয়ই আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি ও লেখাপড়ার অবমান তথা শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য। দেশের ভালো ভালো বিদ্যাপিঠগুলোর কথা রেখে সমস্ত বিদ্যালয়-কলেজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যাবে সর্বদা সেখানে লেখাপড়ার প্রতি অনীহাভাব। এই অনীহাভাবের জন্য দায়ী শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা। ভারী ভারী মাথাওয়ালা পণ্ডিত সমাজ প্রতিবছরই এদেশে বইপত্রের সিলেবাস তৈরী করেন। কিন্তু সাধারণ মেধার ছেলেরা গড়পড়তায় সে মোটা সিলেবাস নিয়ে হিমসিম খায়, কখনো বিদ্যাপীঠেই সিলেবাস শেষ হয় না। কখনো উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে জটিল বিষয়গুলো তাদের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে যায়। ফলে পরীক্ষার পর রেজাল্টে দেখা যায় তাদের হতাশাব্যঞ্জক চিত্র।

কিছুদিন আগেই মাত্র এইচএসসি'র রেজাল্ট হলো। বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী এবারও পরীক্ষায় ফেল করেছে। দেখা যাবে ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই ইংরেজীতে ফেল করেছে। এর কারণও ঐ বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া ও ভালো শিক্ষকের অভাব। অনেক ভালো ছাত্রই ছোটবেলায় ভালো শিক্ষকের কাছে ইংরেজী না পড়তে পেরে ঐ ভাষা নিয়ে বড় বিপর্যস্ত হয়। এবং ঐ ইংরেজী ও কঠিনতর কোন বিষয়ের জন্য ফেল করে।

এবছর বোর্ডের চেয়ারম্যান সাহেব এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, ভালো রেজাল্ট এখন সামর্থবান পিতা-মাতার সন্তানদের জন্য। গরীব ও বিত্তহীন বাবা-মা'র সন্তানরা প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়তে পারে না, কাজেই তাদের দুর্বলতার স্থানগুলো ঢাকতে তারা মরিয়া হয়ে নকলের আশ্রয় নেয়। বিষয়টি কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবেই উপস্থাপন করেছেন তিনি। গত বছর পরীক্ষার রেজাল্ট হলে জানা গেল একজন পিতা মাসিক দশ হাজারে দশ জন টিচার রেখে দশ বিষয় পড়িয়ে ছেলের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কাজেই সোনার রেজাল্ট এখন সোনার জালে আটকা তা বলাইবাহুল্য।

এর পাশাপাশি মধ্যবিত্ত পরিবারেও এখন প্রচণ্ড লড়াই। ছেলেমেয়েরা নিজ নিজ বিষয় পড়ালেখা করার জন্য মাতা-পিতাকে চাপ দেয় প্রাইভেট পড়াবার জন্য। বেসরকারী স্কুলের পেশাদারী শিক্ষকদের কথা না হয় বাদই গেলো। সরকারী স্কুল-কলেজের অংক-ইংরেজী, ফিজিক্স-কেমেস্ট্রির টিচারদেরও পোয়াবারো। তাঁরা অধিকাংশই স্কুল-কলেজের নিয়মিত পাঠদান বিঘ্নিত করে ঘরে বিদ্যা বিক্রি করেন। এতে লাভবান হন তারা। বিদ্যা বিকানোর ব্যবসা এখন পেশাদারী শিক্ষকদের লাল করে দিচ্ছে।

কাজেই এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দুইটি বিভাগ দেখা দেয়। এক শিক্ষক পোষা ছাত্র অন্যরা নিজে নিজে ছাত্র। নিজে নিজে ছাত্ররাই ফেলের হার বাড়িয়ে পিতা-মাতার ভার বোঝা হয়ে থাকে। আমার মনে হয় এসব কারণেই শিক্ষার প্রতি সাধারণের নিরাকাঙ্ক্ষা দেখা দিচ্ছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী শৈশবেই শিক্ষার আলো নিবিয়ে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে।

যে কোন দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত সে দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ। স্বাধীনতার পর যত উন্নয়ন উন্নয়ন বলে প্রচারণা চলেছে তাতে দেখা যায় উন্নয়ন আর যাতেই হোক শিক্ষা ক্ষেত্রে হয়নি। স্বাধীনতার পর পরই সরকারী ঘোষণা ছিল 'ক্লাস এইট পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করা হবে।' কার্যতঃ ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত অবৈতনিক করা হলেও প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিনামূল্যে বই বিতরণের কর্মসূচী আজও ভালোভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ছাত্র বৃত্তির পরিমাণ সীমিত। এরপরও এই ছাত্র বৃত্তির উপর আছে দুর্নীতির ছায়া। এক শ্রেণীর শহুরে অভিভাবক প্রাইমারী বৃত্তি পরীক্ষার্থী হিসেবে গ্রামের স্কুল থেকে ছেলেমেয়েদের বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করান। এতে করে যে বৃত্তিটি একজন গরীব মেধাবানের হতে পারতো তা না হয়ে সেটি বেহাত হয়ে যায়। এই কারচুপির ব্যবস্থা প্রাইমারী শিক্ষা ক্ষেত্রেও বহুদিন থেকে চলে আসছে। আমার মনে হয় দেশকে অন্ততঃ মোটামুটিভাবে শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়োজনেই গ্রামে-গঞ্জের ছাত্র বৃত্তি বেশী করে বাড়ানো দরকার এবং সে হিসেবে ছাত্র বৃত্তির পরিমাণও বাড়াতে হবে। যাতে অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানোকে কখনোই বাড়তি বোঝা বলে ভাবতে না পারেন।

প্রাইমারী শিক্ষকদের সম্পর্কে বলতে হয়, তারা একটি ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করলেও কেন যে মান্ধাতার আমলে ফিরে যান তা বলা মুশকিল। এখনো গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায়, বেতের পিটুনি খেয়ে ছাত্র স্কুল ও শিক্ষককে শাসিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছে। শিক্ষকরা সেই ঝড়ে বেড়া উড়া ঘরে বসে বসে ঝিমিয়ে মাস শেষে বেতন নিয়ে একটা সরকারী চাকরি করেন। ছাত্র সংখ্যা বাড়ে না, পড়াশোনার উন্নয়নের বালাই নেই।

আসলে দেশের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন ধর্মঘট, হরতাল, শিক্ষা-দীক্ষা হীনতা ও বই-পুস্তকের সংকটাপন্ন অবস্থায় নিমজ্জিত তখন নিম্নতর শ্রেণীসমূহের সামনে আর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোথায়? কিসের উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিম্নতর শিক্ষার্থী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বেলিত করবে? কিন্তু এ প্রশ্নের জটিল আবর্তে যতই সঠিক উত্তর পথ খুঁজুক— শিক্ষার অরাজকতা রোধ করে পথ একটি খুঁজে পেতেই হবে। একমাত্র শিক্ষা ও শিক্ষিত জনই পারে আজকের সামাজিক সমস্যা ও জটিলতা নিরসন করে মুক্ত আলোয় দেশকে উদ্ভাসিত করতে। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শিক্ষকদের বেতনভাতা নিশ্চিতকরণই নয়, একেবারে গোড়ার দিক থেকে শিক্ষার সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। যে কোনভাবেই সিলেবাসের কাঠিন্য, বিষয়ের ভার, বেতনের ভার লাঘব করে ছাত্রদেরকে একটি সুষ্ঠু পথ ধরিয়ে দিতে হবে। সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণের প্রাইভেট টিউশনিকে নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। তা না হলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্ররা বার বার ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হবে।